হয়ে গিয়েছে। সত্যকথা এই যে, মানবসমাজের পক্ষে রূপজ্ঞান লাভ করাই সাধনা-সাপেক্ষ— খোয়ানো সহজ। আমাদের পূর্বপুরুষদের সাধনার সেই বঞ্চিত ধন আমরা অবহেলাক্রমে হারিয়ে বসেছি। বিলেতি সভ্যতার কেজো অংশের সংস্পর্শে আমাদের মনের ভিত টলুক আর না-টলুক, তার চূড়া ভেঙে পড়েছে।

এবিষয়ে বৌদ্ধদর্শনের মত প্রণিধানযোগ্য। বৌদ্ধদার্শনিকেরা কল্পনা করেন যে, এ জগতে নানা লোক আছে। সবনীচে কামলোক, তার উপরে রূপলোক, তার উপরে ধ্যানলোক ইত্যাদি।

আমার ধারণা, আমরা-সব জন্মত কামলোকের অধিবাসী ; সুতরাং রূপলোকে যাওয়ার অর্থ আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।

আর-এক কথা, রূপের চর্চার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আমরা দরিদ্র জাতি— অতএব ও আমাদের সাধনার ধন নয়। এ ধারণার কারণ, ইউরোপের কমার্শিয়ালিজম্ আমাদের মনের উপর এ যুগে রাজার মত প্রভুত্ব করছে। সত্যকথা এই যে, জাতীয়-শ্রীহীনতার কারণ অর্থের অভাব নয়, মনের দারিদ্র্য। তার প্রমাণ, আমাদের হালফ্যাশানের বেশভূষা সাজসজ্জা আচার-অনুষ্ঠানের শ্রীহীনতা সোনার-জলে ছাপানো বিয়ের কবিতার মত আমাদের ধনীসমাজেই বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। আসল কথা, আমাদের নবশিক্ষার বৈজ্ঞানিক আলোক আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করুক আর নাই-করুক, আমাদের রূপকানা করেছে। 'গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়'— ভারতচন্দ্রের একথা সুন্দরের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে, আমাদের সকলের পক্ষেই সমান খাটে। আর যদি এইকথাই সত্য হয় যে, আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি নে— তা হলে আমাদের সুন্দরভাবে মরাই শ্রেয়। তাতে পৃথিবীর কারও কোনো ক্ষতি হবে না, এমন-কি আমাদেরও নয়।

ফাল্গুন ১৩২৩

ফাল্গুন

আমাদের দেশে কিছুরই হঠাৎ বদল হয় না, ঋতুরও নয়। বর্ষা কেবল কখনো-কখনো বিনা-নোটিশে একেবারে হুড়্দুম করে এসে গ্রীষ্মের রাজ্য জবরদখল করে নেয়। ও ঋতুর চরিত্র কিন্তু আমাদের দেশের ধাতের সঙ্গে মেলে না। প্রাচীন কবিরা বলে গেছেন, বর্ষা আসে দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার মত— আকাশে জয়ঢাক বাজিয়ে, বিদ্যুতের নিশান উড়িয়ে, অজস্র বরুণাস্ত্র বর্ষণ ক'রে, এবং দেখতে-না-দেখতে আসমুদ্রহিমালয় সমগ্র দেশটার উপর একছত্র আধিপত্য বিস্তার ক'রে। এক বর্ষাকে বাদ দিলে, বাকি পাঁচটা ঋতু যে ঠিক কবে আসে আর কবে যায়, তা এক জ্যোতিষী ছাড়া আর-কেউ বলতে পারেন না। আমাদের ছয় রাগের মধ্যে এক মেঘ ছাড়া আর পাঁচটি যেমন এক স্বর থেকে আর-একটিতে বেমালুমভাবে গড়িয়ে যায়— আমাদের স্বদেশী পঞ্চঋতুও তেমনি ভূমিষ্ঠ হয় গোপনে, ক্রমবিকশিত হয় অলক্ষিতে, ক্রমবিলীন হয় পরঋতুতে।

ইউরোপ কিন্তু ক্রমবিকাশের জগৎ নয়। সেদেশের প্রকৃতি লাফিয়ে চলে, এক ঋতু থেকে আর-এক ঋতুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বছরে চার বার নবকলেবর ধারণ করে, নবমূর্তিতে দেখা দেয়। তাঁদের প্রতিটির রূপ যেমন স্বতন্ত্র তেমনি স্পষ্ট। যাঁর চোখ আছে তিনিই দেখতে পান যে, বিলেতের চারিটি ঋতু চতুর্বর্ণ। মৃত্যুর স্পর্শে বহু যে এক হয়, আর প্রাণের স্পর্শে এক যে বহু হয়, এ সত্য সেদেশে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানে শীতের রং তুষার-গৌর, সকল বর্ণের সমষ্টি ; আর বসন্তের রং ইন্দ্রধনুর, সকল বর্ণের ব্যষ্টি। তার পর নিদাঘের রং ঘন-সবুজ, আর শরতের গাঢ়-বেগনি। বিলেতি ঋতুর চেহারা শুধু আলাদা নয়, তাদের আসা-যাওয়ার ভঙ্গিও বিভিন্ন।

সেদেশে বসন্ত শীতের শব-শীতল কোল থেকে রাতারাতি গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে, মহাদেবের যোগভঙ্গ করবার জন্য মদন-সখা বসন্ত যেভাবে একদিন অকস্মাৎ হিমাচলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোনো-এক সুপ্রভাতে ঘুম ভেঙে চোখ মেলে হঠাৎ দেখা যায় যে, রাজ্যির গাছ মাথায় একরাশ ফুল প'রে দাঁড়িয়ে হাসছে, অথচ তাদের পরনে একটিও পাতা নেই। সে রাজ্যে বসন্তরাজ তাঁর আগমনবার্তা আকাশের নীল পত্রে সাতরঙা ফুলের হরফে এমন স্পষ্ট এমন উজ্জ্বল করে ছাপিয়ে দেন যে, সে বিজ্ঞাপন — মানুষের কথা ছেড়ে দিন— পশুপক্ষীরও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

ইউরোপের প্রকৃতির যেমন ক্রমবিকাশ নেই, তেমনি ক্রমবিলয়ও নেই ; শরৎও সেদেশে কালক্রমে জরাজীর্ণ হয়ে অলক্ষিতে শিশিরের কোলে দেহত্যাগ করে না। সেদেশে শরৎ তার শেষ-উইল— পাণ্ডুলিপিতে নয়— রক্তাক্ষরে লিখে রেখে যায় ;

কেননা, মৃত্যুর স্পর্শে তার— পিত্ত নয়— রক্ত প্রকুপিত হয়ে ওঠে। প্রদীপ যেমন নেভবার আগে জ্বলে ওঠে, শরতের তাম্রপত্রও তেমনি ঝরবার আগে অগ্নিবর্ণ হয়ে ওঠে। তখন দেখতে মনে হয়, অস্পৃশ্য শত্রুর নির্মম আলিঙ্গন হতে আত্মরক্ষা করবার জন্য প্রকৃতিসুন্দরী যেন রাজপুত-রমণীর মত স্বহস্তে চিতা রচনা করে সোল্লাসে অগ্নিপ্রবেশ করছেন।

২

এদেশে ঋতুর গমনাগমনটি অলক্ষিত হলেও তার পূর্ণাবতারটি ইতিপূর্বে আমাদের নয়নগোচর হত। কিন্তু আজ যে ফাল্গুনমাসের পনেরো তারিখ, এ সুখবর পাঁজি না দেখলে জানতে পেতুম না। চোখের সুমুখে যা দেখছি তা বসন্তের চেহারা নয়, একটা মিশ্রঋতুর— শীত ও বর্ষার যুগলমূর্তি। আর এদের পরস্পরের মধ্যে পালায়-পালায় চলছে সন্ধি ও বিগ্রহ। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও শীত ও বর্ষার দাম্পত্যবন্ধন এভাবে চিরস্থায়ী হওয়াটা আমার মতে মোটেই ইচ্ছনীয় নয়। কেননা, এহেন অসবর্ণ-বিবাহের ফলে শুধু সংকীর্ণবর্ণ দিবানিশার জন্ম হবে।

এই ব্যাপার দেখে আমার মনে ভয় হয় যে, হয়তো বসন্ত ঋতুর খাতা থেকে নাম কাটিয়ে চিরদিনের মত এদেশ থেকে সবে পড়ল। এ পৃথিবীটি অতিশয় প্রাচীন হয়ে পড়েছে; হয়তো সেই কারণে বসন্ত এটিকে ত্যাগ করে এই বিশ্বের এমন-কোনো নবীন পৃথিবীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, যেখানে ফুলের গন্ধে পত্রের বর্ণে পাখির গানে বায়ুর স্পর্শে আজও নরনারীর হৃদয় আনন্দে আকুল হয়ে ওঠে।

আমরা আমাদের জীবনটা এমন দৈনিক করে তুলেছি যে, ঋতুর কথা দূরে যাক, মাস-পক্ষের বিভাগটারও আমাদের কাছে কোনো প্রভেদ নেই। আমাদের কাছে শীতের দিনও কাজের দিন, বসন্তের দিনও তাই; এবং অমাবস্যাও ঘুমবার রাত, পূর্ণিমাও তাই। যে জাত মনের আপিস কামাই করতে জানে না, তার কাছে বসন্তের অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই, কোনো সার্থকতা নেই— বরং ও একটা অনর্থেরই মধ্যে; কেননা, ও-ঋতুর ধর্মই হচ্ছে মানুষের মন-ভোলানো, তার কাজ-ভোলানো। আর আমরা সব ভুলতে সব ছাড়তে রাজি আছি, এক কাজ ছাড়া; কেননা, অর্থ যদি কোথাও থাকে তো ঐ কাজেই আছে। বসন্তে প্রকৃতিসুন্দরী নেপথ্যবিধান করেন; সে সাজগোজ দেখবার যদি কোনো চোখ না থাকে, তা হলে কার জন্যই-বা নবীন পাতার রঙিন শাড়ি পরা, কার জন্যই-বা ফুলের অলংকার ধারণ, আর কার জন্যই-বা তরুণ আলোর অরুণ হাসি হাসা? তার চাইতে চোখের জল ফেলা ভালো। অর্থাৎ এ অবস্থায় শীতের